নির্মিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছবি

হয়নি যুদ্ধের দলিল

তারেক মাসুদের মুক্তির গান ছবির একটি দৃশ্য

সংস্কৃতির অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম হলো চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্র শুধু বিনোদন মাধ্যমই নয়, বরং এটি দেশ-জাতি-সমাজের দর্পণও। যা একটি দেশের নাগরিক জীবনযাপন থেকে শুরু করে জাতির ভাবমূর্তি তুলে ধরে, মতাদর্শও প্রচার করে। সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষের কাছে খুব সহজেই দিকনির্দেশনামূলক বার্তাও পৌঁছে দেয়। চলচ্চিত্র সাধারণ মানুষকে সচেতন করার পাশাপাশি জাতীয় প্রয়োজনে জনমত সৃষ্টিতে কিংবা জাতিকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতেও যথেষ্ট অবদান রাখে। যেমন- ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর ম্যাক্সিম গোর্কির বিখ্যাত উপন্যাস 'মা' (মাদার) অবলম্বনে তৈরি সিনেমাটি রাশিয়ার জনগণকে দেশ গঠনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তেমনি মহান মুক্তিযুদ্ধের সামান্য আগে কালজয়ী চলচ্চিত্রকার জহির রায়হানের 'জীবন থেকে নেয়া' সিনেমাটিও সেই সময়ের উত্তাল আন্দোলনের সপক্ষে জনমত তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

আমাদের দেশে চলচ্চিত্রকে বিনোদনের মূল মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হলেও উন্নত দেশে একে ব্যবহার করা হয় গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পৌঁছানোর মাধ্যম হিসেবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে প্রতিরক্ষা কর্মকর্তারা মনে করেন, আমেরিকানদের কাছে পেন্টাগনের সমান গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হলিউড। চলচ্চিত্র মাধ্যম যে কতোটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে তার প্রমাণ এ দেশেও মিলেছে বহুবার। কিন্তু এ দেশে চলচ্চিত্রই সম্ভবত সবচেয়ে উপেক্ষিত ও সমালোচিত মাধ্যম। এ শিল্পের প্রতি সরকারের উদাসীনতা সত্ত্বেও ব্যক্তি উদ্যোগে কমবেশি প্রসার ঘটেছে। এতে সমাজের বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি মহান মুক্তিযুদ্ধও ওঠে এসেছে। এসব চলচ্চিত্রে ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির নিঃস্বার্থ ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার বীরত্বগাথা তুলে ধরা হয়েছে। তবে চলচ্চিত্র বোদ্ধাদের মতে, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছবিতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আবেগের চেয়ে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যই বেশি কাজ করেছে।

এবারের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় অর্জনের ৩৪ বছর পূর্ণ হচ্ছে। এই দীর্ঘ সময়ে মুক্তিযুদ্ধকে উপজীব্য করে প্রামাণ্যচিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্য এবং পূর্ণদৈর্ঘ্যসহ অর্ধশতাধিক চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে উল্লেখ করার মতো রয়েছে হাতে গোনা কয়েকটি ছবি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নির্মিত কোনো কোনো ছবিতে সরকারের প্রেরণা, চাপ ও পরামর্শে ইতিহাস বিকৃতির ন্যক্কারজনক ঘটনাও ঘটেছে। কারণ যখন যে দল ক্ষমতায় এসেছে তাদের পছন্দকেই প্রাধাণ্য দিয়ে বহু সিনেমা করতে হয়েছে নির্মাতাদের। বহু বছর ধরে তো দেশে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র খুব একটি নির্মিত হচ্ছে না বললেই চলে। এই অবস্থায় পর্যবেক্ষকরা মনে করেন, নতুন এক দেশ গড়ার প্রত্যয়ে যাঁরা একদিন মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তাদের সেই স্বপ্ন এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার এই দেশটিতে আজ যখন একাত্তরের পরাজিত শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তখন নতুন প্রজন্মের সামনে ৩০ লাখ শহীদের বীরোচিত সাফল্যগাথা তথা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আবারও চলচ্চিত্র তৈরি করা প্রয়োজন, যাতে পরাজিত ও ঘাতক অপশক্তির মুখোশ উন্মোচনের মাধ্যমে তাদের প্রতিহত করার ব্যাপারে জনমত সৃষ্টি হয়।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন থেকে শুরু হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছবি নির্মাণ। যুদ্ধের সময় মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে দুটি পূর্ণদৈর্ঘ্য এবং কিছু প্রামাণ্যচিত্র (ডকুমেন্টারি) নির্মিত হয়। সে সময় কলকাতার উমাপ্রসাদ মৈত্র বাংলা ভাষায় নির্মাণ করেন 'কাহিনীচিত্র'। একই সময় মুম্বাইয়ে আইএস জোহর হিন্দিতে নির্মাণ করেন 'জয় বাংলাদেশ' নামের একটি ছবি। এ ছবিতে অভিনয় করেন এ দেশের শিল্পী কবরী। এই ছবিতে মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টি সঠিকভাবে প্রতিফলিত না হওয়ায় বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আপত্তি ওঠে। ফলে ভারত সরকার ছবিটি নিষিদ্ধ করে। এরপর ভারতে ঋত্বিক ঘটক এবং শুক দেব নির্মাণ করেন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে

দুটি প্রামাণ্যচিত্র। মুক্তিযুদ্ধকালেই বাংলাদেশের প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান রণাঙ্গনের যুদ্ধদৃশ্য, লাখ লাখ বাঙালির শরণার্থী হয়ে ভারতে যাওয়া ও নানা দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে 'স্টপ জেনোসাইড', 'স্টেট ইজ বর্ন' নামে দুটি ডকুমেন্টারি তৈরি করেন। তিনি 'লেট দেয়ার বি লাইট' নামে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণেও হাত দেন তখন। কিন্তু ছবিটি তিনি শেষ করতে পারেননি। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর তিনি নিখোঁজ হলে ছবিটি অপূর্ণাঙ্গই থেকে যায়। পরবর্তীতে অসমাপ্ত অবস্থাতেই এই ছবিটি মুক্তি দেওয়া হয়। এছাড়া আলমগীর কবির নির্মাণ করেন দুটি আর বাবুল চৌধুরী একটি।

দেশ স্বাধীনের পর অনেকেই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কাহিনীচিত্র তৈরির কথা বললেও প্রথম এগিয়ে আসেন চাষী নজরুল ইসলাম। তার সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা ও নায়ক মাসুদ পারভেজ (সোহেল রানা), খসরু, কাজি আজিজ, নান্টুসহ আরো কয়েকজন এগিয়ে আসেন। ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯ ডিসেম্বর চলচ্চিত্র নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধে ঘটে যাওয়া কাহিনী নিয়ে ১৯৭২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে চাষী নজরুল ইসলাম শুটিং শুরু করেন। 'ওরা ১১ জন' ছবিটির নামকরণ হয়েছে তৎকালীন ছাত্র আন্দোলনের ১১ দফা দাবির ইমেজটাকে ব্যবহার করে। ছবিতে ৯ জন মুসলমান, একজন হিন্দু এবং একজন খ্রিষ্টান মুক্তিযোদ্ধাকে আনা হয়েছিল প্রতীকী হিসেবে। এই ১১ জন মুক্তিযোদ্ধা ছাড়াও অভিনয় করেন রাজ্জাক-শাবানা ছাড়াও অনেকেই। ছবিটি মুক্তি দেয়া হয় একই বছর ১২ আগস্ট। একই সময় সুভাষ দত্ত নির্মাণ করেন অরুণোদয়ের 'অগ্নিসাক্ষী'। এ ছবিতে মূল চরিত্রে অভিনয় করেন ববিতা ও উজ্জল। এরপর মমতাজ আলী নির্মাণ করেন 'রক্তাক্ত বাংলা' এ ছবিতে অভিনয় করেন কবরী, সুলতানা ও কলকাতার বিশ্বজিৎ। তার নির্মিত 'বাঘা বাঙালি' ছবিতে অভিনয় করেন নূতন, খসরুসহ অনেকে।

১৯৭৩ সালে আলমগীর কবির নির্মাণ করেন 'ধীরে বহে মেঘনা' ছবিটি। এতে অভিনয় করেন ববিতা, আজমল হুদা, গোলাম মুস্তাফাসহ অনেকেই। ১৯৭৪ সালে চাষী নজরুল ইসলাম-নূতন,রওশন জামিলসহ অনেককে নিয়ে নির্মাণ করেন 'সংগ্রাম' নামের ছবিটি। একই সময়ে আলমগীর কুমকুম কবরী ও আলমগীরকে নিয়ে নির্মাণ করেন 'আমার জন্মভূমি' ছবিটি। পরবর্তীতে পুরোপুরি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক না হলেও সে সময়ের ঘটনা এবং পরবর্তী প্রেক্ষাপট নিয়ে নির্মিত হয় বেশ কিছু ছবি। ববিতা, ফারুক, রাইসুল ইসলাম আসাদকে নিয়ে আতাউর রহমান নির্মাণ করেন 'আবার তোরা মানুষ হ'। রাজ্জাক, ববিতা, সুজাতা, আনোয়ার হোসেনসহ অনেকের অভিনয়ে মিতা নির্মাণ করেন 'আলোর মিছিল'। এরপর হারুনুর রশীদ নির্মাণ করেন মাথীন, ওমর এলাহী, শিশুশিল্পী আদনানসহ অনেকের অভিনয়ে ছবি 'মেঘের অনেক রং'। পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধাভিত্তিক ছবির নির্মাণ বছর পাঁচেক বন্ধ থাকে। এরপর ১৯৭৯ সালে শহিদুল হক খান, সোহেল রানা, ইলিয়াস কাঞ্চন, কবরী, সুচরিতাসহ অনেককে নিয়ে নির্মাণ করেন 'কলমিলতা'। এই ছবির নির্মাণের পর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি বেশ কয়েক বছর আর করা হয়নি। এই সময় অবশ্য স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি নির্মিত হয়। যার মধ্যে রয়েছে মোরশেদুল ইসলামের 'আগামী' মোস্তফা কামালের 'প্রত্যাবর্তন', তানভীর মোকাম্মেলের 'নদীর নাম মধুমতি' নাসির উদ্দিন ইউসুফের 'একাত্তরের যীশু'সহ বেশ কয়েকটি ছবি।

চাষী নজরুলের ওরা ১১ জন এবং সুভাষ দত্তের ছবি অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি নির্মাণের সাময়িক বিরতির পর ১৯৯৩-৯৪ সালে হুমায়ূন আহমেদ নির্মাণ করেন আগুনের পরশমণি' ছবিটি। এতে অভিনয় করেন আসাদুজ্জামান নূর, আবুল হায়াত, ডলি জহুর, বিপাশা হায়াতসহ অনেকে।

হুমায়ূন আহমেদের পর চাষী নজরুল ইসলাম নির্মাণ করেন 'হাঙর নদী গ্রেনেড' ছবিটি। ছবিতে অভিনয় করেন সোহেল রানা, অরুণা বিশ্বাস, সুচরিতাসহ অনেকেই। সেলিনা হোসেনের উপন্যাস অবলম্বনে 'হাঙর নদী গ্রেনেড' ছবিটি নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়। অসুস্থতার কারণে এটি নির্মাণ করতে পারেননি তিনি। এরপর একই কাহিনী নিয়ে ছবি নির্মাণের কথা ছিল আলমগীর কবিরের। কিন্তু তার অকাল মৃত্যুতে ছবিটি নির্মাণ সম্ভব হয় না। এরপর আতাউর রহমান নির্মাণ করেন 'এখনো অনেক রাত' ছবিটি। এরই মধ্যে তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ নির্মাণ করেন 'মুক্তির কথা' ও 'মুক্তির গান' নামের দুটি প্রামাণ্য চিত্র মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক। ২০০২ সালে কাওসার চৌধুরী নির্মাণ করেন প্রামাণ্য ছবি 'সেই রাতের কথা বলতে এসেছি।' এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছবির মধ্যে রয়েছে-'সূচনা', 'দূরন্ত', 'আমরা তোমাদের ভূলবন,একজন মুক্তিযোদ্ধা','ইতিহাসকন্যা', 'স্মৃতি ৭১', 'বীরশ্রেষ্ঠ'সহ বেশ কিছু ছবি।

বিভিন্ন সময় নানা প্রতিকূলতায় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছবি বন্ধ থাকলেও প্রতিবছর নির্মিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নাটক ও প্রামাণ্য অনুষ্ঠান। আবারও ৫/৬ বছর পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি নির্মাণ বন্ধের পর ২০০৩ সালে বাবেয়া খাতুনের উপন্যাস নিয়ে চাষী নজরুল ইসলাম নির্মাণ করেন 'মেঘের পর মেঘ'। এ ছবিতে অভিনয় করেছেন-রিয়াজ, পূর্ণিমা, মাহফুজসহ অনেকে। ২০০৪-এ হুমায়ূন আহমেদ নির্মাণ করলেন তার মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় ছবি 'শ্যামল ছায়া'। এ ছবিতে অভিনয় করেন শাওন, রিয়াজ, তানিয়া, হুমায়ূন ফরিদীসহ অনেকে। একই বছর তৌকীর আহমেদ নির্মাণ করেন আমজাদ হোসেনের 'অবেলা অসময়' উপন্যাস আলম্বনে 'জয়যাত্রা' ছবিটি। এতে অভিনয় করেছেন- হুমায়ূন ফরিদী, বিপাশা হায়াত, মাহফুজসহ অনেকে। এছাড়াও সম্পূর্ণ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নয়, তবে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে বেশ কিছু ছবি।

মুক্তিযুদ্ধের ছবি নিয়ে চলচ্চিত্রবোদ্ধারা সব সময়ই বলে আসছেন ছবিতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার এবং আবেগের চেয়ে বাণিজ্যিক লক্ষ্যই বেশি কাজ করছে। আবার সেই সঙ্গে ছবিতে কিছু কিছু ঘটনা বাস্তবতার সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। আর ইতিহাস বিকৃতির ঘটনাও রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, যুদ্ধ আর রাজাকারের বিষয়টিই বারবার ঘুরেফিরে থাকে পুরো ছবিতে। পাশাপাশি অন্য দিকগুলোও উপেক্ষিত।

যারা মুক্তিযুদ্ধের ছবি নির্মাণ করেছেন এবং অভিনয় করেছেন তারা কতোটুকু সন্তুষ্ট এসব ছবি নিয়ে? চলচ্চিত্র নির্মাতা চাষী নজরুল ইসলাম মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার চেয়ে বাণিজ্যিক বিষয়টি প্রাধান্য পাচ্ছে এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে কি করণীয় সে সম্পর্কে সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আসলে এটা অস্বীকার করার মতো নয় যে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ছবিতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার চেয়ে বাণিজ্যিক বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র, গান বা নাটকে সঠিক মুক্তিযুদ্ধের চিত্র তুলে আনতে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি এটা ঠিক। মূল কারণ হলো, সরাসরি সহযোগিতা না পাওয়া। যে সরকারি সময়ের প্রেক্ষাপট ফুটিয়ে তুলতে যে অর্থনৈতিক এবং সরকারি সাহায্যের প্রয়োজন তা আমরা পাচ্ছি না। যার জন্যই হয়ত এমনটি হচ্ছে। আমরা '৭১-এ যুদ্ধ করেছি শোষক ও শাসকের বিরুদ্ধে এবং ৫টি মৌলিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে। সে সময় আমাদের মধ্যে ঐক্য ছিল বলেই জয়ী হয়েছি।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদেরকে কাদা ছোড়াছুড়ি বাদ দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। তবে জাতিকে এই ক্রান্তিলগ্ন থেকে মুক্তি দেয়া সম্ভব।'

চলচ্চিত্র নির্মাতা তারেক মাসুদের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছবি নিয়ে কথা হলে তিনি বলেন,

'মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ছবিতে সব সময় ধর্ষণ আর রক্তাক্ত দিকটিকে পুঁজি করা হয়েছে, উপজীব্য না করে যুদ্ধকে পণ্য করা হয়েছে। অথচ উপেক্ষিত থেকেছে মুক্তির দিকটি। মুক্তিযুদ্ধের রয়েছে মহাকাব্যিক ব্যাপকতা। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কাজ করার প্রচুর দিক রয়েছে। এসব দিক নিয়ে কাজ করলে মুক্তিযুদ্ধের অনেকগুলি খন্ডচিত্র থেকে বেরিয়ে আসবে একটি অখন্ড চিত্র। যেমন অনেক ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের সময়ের মানবিক দিক উপেক্ষিত হয়েছে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলোতে। ধরা যাক মুক্তিযুদ্ধের সময় শরণার্থীদের কথাই। অথচ এই শরণার্থীদের সংখ্যা ছিল ১ কোটি । তারা কিভাবে সেই ৯ মাস কাটিয়েছেন, কিভাবে দেশে ফিরে এলেন- মুক্তিযুদ্ধের এমন সব বিন্দু বিন্দু খন্ডচিত্র নিয়ে কাজ হতে পারে, বিশাল ক্যানভাসে না গিয়ে তাদের দুঃখ দুর্দশা নিয়েও। আবার যুদ্ধের সময় ৭ থেকে ৮ কোটি লোকের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন হয়তো ১ কোটি লোক। বাকি এতো মানুষের সে সময়ে নিত্য দিনের জীবন সংগ্রামের দিনগুলো নিয়েও নির্মিত হতে পারে ছবি। মুক্তিযুদ্ধকে পটভূমি করে ছবি বানানোর উদ্যোগ দরকার। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে চলচ্চিত্রের কথা এলেই বলতে হয়, 'ধীরে বহে মেঘনা' ছবিটির কথা। এ ছবির নির্মাতা আলমগীর কবির। 'অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী' ছবিটিও ব্যতিক্রমধর্মী। তবে স্বাধীন ধারায় নির্মিত কিছু কাহিনীচিত্র এবং প্রামাণ্যচিত্রেও ভালো কাজ হয়েছে। সর্বশেষ উদাহরণ হলো অসাধারণ ভিডিও চিত্র 'স্বাধীনতা'।

আমরা সবাই '৭১-এ যুদ্ধ করেছিলাম একটি সার্বভৌম বাংলাদেশ পেতে। আমরা পেয়েছি বাংলাদেশ। এখন যারা বোমাবাজি করছে তারা নিশ্চয় এই সার্বভৌমত্ব চায়নি। তাহলে কোন বাংলাদেশ চায় তারা? এর পেছনে রয়েছে বড় প্রশ্ন? প্রসঙ্গত ইরাকের কথা বলতে হয়। ইরাকে আত্মঘাতী হামলা চলছে দখলদারদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য। কিন্তু এদেশে তো দখলদার নেই, আমরা কেন আমাদের মানুষকেই মারছি। যারা এসব করছে তারা নিশ্চয় এদেশ, এ রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে মানতে রাজি নয়। আমরা '৭১-এ সবাই এক ছিলাম কয়েকজন ছাড়া। আমাদের ঐক্যবোধের কারণে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে হারিয়ে সার্বভৌম দেশ অর্জন করেছি। কিন্তু পাকবাহিনীর যারা দোসর ছিল তারা একটি দেশের নিরীহ মানুষসহ এদেশের মাথা অর্থাৎ বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে। তাদের ধারণা, বুদ্ধিজীবী হত্যা করলেই সব শেষ হয়ে যাবে। আজ সারাবিশ্বে রক্তপাতের জন্য দায়ী করা হচ্ছে যে আল-কায়েদাকে, তাদের আত্মপ্রকাশ সাম্প্রতিক সময়ে। কিন্তু আল বদর, আল শামস এদেরকে আমরা চিনি ৩৪ বছর ধরে। ৩৪ বছর আগে বুঝেছি এবং তাদের পরাজিতও করেছি। কিন্তু সত্যিই কি তাদের পরাজিত করতে পেরেছি? করে থাকলে আজ কেন এই অবস্থা? সেই পরাজিতশক্তি আমাদের সমাজ এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে সুপ্ত অবস্থায় ছিল। এখন তারা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তাইতো তারা স্বাধীন সার্বভৌম দেশকে মানছে না। এই প্রেক্ষিতে আমাদের সবাইকে এক হয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। সে ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র রাখতে পারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও বর্তমান প্রেক্ষাপট নিয়ে এ প্রজন্মের নির্মাতাদেরকে ছবি বানাতে এগিয়ে আসতে হবে।'

বিশিষ্ট চলচ্চিত্রবোদ্ধা ও 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্র' নামের বইটির লেখক মির্জা তারেকুল কাদের বলেন, 'চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কাছে দর্শকের চাওয়া মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাসটা তুলে ধরা। আমার অভিজ্ঞতার আলোকে দেখেছি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছবিগুলোতে তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এমন কি সে সময়ের আসল চিত্র পুরোপুরি ফুটিয়ে তুলতে নির্মাতারা ব্যর্থ হয়েছেন। এর অন্যতম কারণ হলো, দু'একজন নির্মাতা ছাড়া অন্য নির্মাতাদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জ্ঞানের পরিধি সীমিত। অন্যদিকে সরকারি সাহায্য-সহযোগিতার অভাবও রয়েছে। তিনি বলেন, এ পর্যন্ত যতোগুলো মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে দু'একটি ছাড়া বেশির ভাগই খুবই নিম্নমানের। কিছু নির্মাতা মুনাফার লক্ষ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটের অজুহাতে ধর্ষণের দৃশ্য প্রাধান্য দিয়ে ছবি বানিয়েছেন। এক কথায় বলতে হয়, যুদ্ধের চেতনায় কালোত্তীর্ণ মুক্তিযুদ্ধের দলিল আমরা চলচ্চিত্র মাধ্যমে এখনো পাইনি। যে কাজটি মুক্তিযোদ্ধা পরিষদের উদ্যোগে হতে পারতো। কিন্তু পরিষদও ব্যর্থ হয়েছে।'

চিত্রনায়িকা ববিতা বলেন, 'আমি নিজেকে অনেক বেশি সৌভাগ্যবান বলে মনে করি মুক্তিযুদ্ধের ছবিগুলোতে কাজ করতে পেরে। সুভাষ দত্তের 'অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী'তে আমি প্রথম জাতীয় পুরস্কার পাই। মুক্তিযুদ্ধের ছবিতে জাতীয় পুরস্কার পাওয়া আমার জন্য ছিল বড় ঘটনা। আমার এখনো মনে আছে কুমিল্লায় গিয়েছিলাম শুটিং করতে। সেখানে দেখেছি যুদ্ধের ভয়াবহতার ছাপ এখনও লেগে আছে।

যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে যে দেশ প্রেম ছিল শিল্প সাহিত্যে তার অনেকটাই অভাব আজকের দিনে। এখন শিল্পের জায়গায় এসেছে বাণিজ্য পণ্য, যা নিয়ন্ত্রণ করছে আমাদের সংস্কৃতি। ফলে নির্মাতারা তাদের পণ্য মানসিকতার কারণে সস্তা বাণিজ্যিক ছবির প্রতি ঝুঁকেছে। ভালো ছবির যে দর্শক ছিল সেই দর্শক এখনও আছে। কিন্তু আমরা তো তাদের ভালো ছবি দেখাতে পারছি না। আমরা দর্শকদের শিল্পক্ষুধা থেকে বঞ্চিত করছি। নানা প্রতিকূলতা থাকবে, তার মধ্যেই এগিয়ে যেতে হবে। আর এই এগিয়ে যাওয়াই শিল্পের প্রতি, দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা।'

রুহুল তাপস

এ সপ্তাহের ঢাকা

- **মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর :** মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজন করেছে ৭ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে আবৃত্তি, নাটক সঙ্গীতানুষ্ঠান, যাত্রা, পুঁথিপাঠ, মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী।

প্রদর্শনীর এই দুটি ছবি বলে দেয় এখনও দুই নেত্রীর ঘুম ভাঙেনি

- **চারুকলা :** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার জয়নুল গ্যালারিতে শুরু হয়েছে পাঁচ ফটো-সাংবাদিক এবং এক শিশু আলোকচিত্রীর ফটোগ্রাফি প্রদর্শনী। শিল্পীরা হলেন- ফিরোজ চৌধুরী, জিয়া ইসলাম, মঞ্জুরুল করিম, শরীফ সারওয়ার, শেখ হাসান এবং শিশু আলোকচিত্রী আফিকা ফাইজা চৌধুরী আদৃতা। প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে ৬ আলোকচিত্রীর ক্যামেরাবন্দি ৬০টি ছবি। আলোকচিত্রী শিল্পীদের এসব শিল্পকর্ম যে কোনো দর্শককে দোলা দেবে নানাভাবে। কেউ বা নিজের অজান্তে ফিরে যাবেন শৈশবের দুরন্তপনায়, আবার বাংলা মায়ের রূপ-সৌন্দর্যে হারিয়ে ফেলবেন নিজেকে। অনেকেই আবার হারিয়ে যাওয়া বাঙালির ঐতিহ্যও খুঁজে পাবেন এই প্রদর্শনীতে স্থান পাওয়া শিল্পকর্ম দেখে। কাউকে আবার চমকে দেবে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আর বিরোধীদলের নেত্রী-শেখ হাসিনার দুটি ছবি। দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ছবি দুটি ছবি দেখে মনে হবে এই ক্রান্তিলগ্নে দুই প্রধান জনপ্রতিনিধির ঘুম যেন ভাঙছেই না। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মুক্তিযোদ্ধা ও ইত্তেফাকের সিনিয়র ফটো-সাংবাদিক মোহাম্মদ আলম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যায়যায়দিনের সম্পাদক শফিক রেহেমানসহ অনেকে। প্রদর্শনী চলবে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। খোলা থাকবে বিকেল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত। উল্লেখ্য, এই প্রদর্শনী শেষ হওয়ার পর ১৮ থেকে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে তেজগাঁও যায়যায়দিন মিডিয়াপ্লেক্স লাভ রোডের পিকাসো গ্যালারিতে।